লেখকের কথা

শুরু করছি মহান আল্লাহর নামে, সমস্ত প্রশংসা যার জন্য বরাদ্দ। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবিকুল শিরোমনি মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কেয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সকল অনুসারীদের ওপর।

একবার আমি হিন্দুস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর একটি বই পড়ছিলাম। বইটির নাম ছিল 'লামহাতুম মিন তারীখিল আলম' (বিশ্ব ইতিহাসের ঝলক)। পড়তে পড়তে আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদ সংক্রান্ত একটি লেখায় আমার চোখ আটকে যায়। যেখানে জওহরলাল নেহরু তার মেয়েকে সম্বোধন করে বলছে, 'তুমি কি বাগদাদ, খলিফা হারুনুর রশিদ, শেহেরজাদ এবং 'আলিফ লায়লা'-এর চটকদার কিসসা-কাহিনি জানো?' শুনো, আব্বাসি শাসনামলে বাগদাদ উন্নতি ও অগ্রগতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল। সেটাকে 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার' শহরও বলা হয়। শহরটি সুবিশাল অট্টালিকা, স্কুল-কলেজ, বাজারঘাট, বাগ-বাগিচা সবকিছুতে সমৃদ্ধ ছিল। সেখানে গান-বাজনা, নারীদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদ সবই চলতো। শহরের ব্যবসায়ীরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যবসায়ীদের সাথেও ব্যাবসায়িক কর্মকাণ্ড চালাতো।

আমার মনে প্রশ্ন উদয় হলো, সত্যিই কি খলিফা হারুনুর রশিদের বাগদাদ শহর এমন ছিল? সেটাই কি 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা'-এর শহর যেখানে মদ, জুয়া, নারীদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদের আসর বসতো?

নিজেকে প্রশ্ন করলাম, বর্তমানে প্রচলিত গ্রন্থসমূহে এবং 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার' কিসসা-কাহিনিতে মুসলিম খলিফা হারুনুর রশিদকে যেভাবে চিত্রায়িত করা হয় তার জীবনচরিত কি সত্যিই এমন? এসব নিয়ে ভাবতে লাগলাম।

ইত্যবসরে আমার এক সহপাঠীর সাথে সাক্ষাৎ হয়, যার ইউরোপ আমেরিকার বহু অঞ্চলে ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা রয়েছে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, এ কয়দিনে নতুন কী রচনা করলে? আমি বললাম, আব্বাসি বাদশাহ হারুনুর রশিদ সম্পর্কে পড়াশোনা করছি। আমার কথায় সে মুচকি হাসলো। বললাম, কী ব্যাপার, হাসছো যে!? সে বললো, আমি ইউরোপ আমেরিকার কোনায় কোনায় এবং ইউরোপের বিভিন্ন শহর চষে বেড়িয়েছি। সেখানকার খুব কম মানুষই হারুনুর রশিদের জীবনচরিত সম্পর্কে অবগত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, সেখানে সবাই 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা' সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানে। এগুলোকে তারা 'আরব্য রজনি' নামে চেনে। তারা বিশ্বাস করে, এসব কিসসা কাহিনির অগ্রনায়ক হলেন হারুনুর রশিদ।

আমি আমার সহপাঠীকে বললাম, তোমার কথায় আমার এই মুসলিম খলিফার জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল।

আমার এ অনুরাগ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যখন তার জীবনচরিত সংক্রান্ত একটি বই আমার হাতে আসে। যে বইটিতে হারুনুর রশিদ সংক্রান্ত এমন কিছু কিসসা-কাহিনি ও দুর্লভ ঘটনাবলি উদ্ধৃত হয়েছে যা তার মতো এমন একজন মহান মুসলিম শাসকের সঙ্গে কোনোভাবেই সঙ্গত নয়, যিনি সারাজীবন একবছর হজ করে ও আরেকবছর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে কাটিয়েছেন।

বইটিতে সুস্পষ্টভাবে বা আকারে-ইঙ্গিতে তার এবং তার সভা সম্পর্কে যেসব কুরুচিপূর্ণ ও অশালীন মন্তব্য করা হয়েছে তা মূলত বইটির লেখকেরই নিম্নরুচির সুস্পষ্ট পরিচায়ক। বরং তার সভা তো ছিল এসব কলঙ্ক থেকে অনেক ঊর্ধ্বে এবং ফিকহ, হাদিস এবং দীন সমৃদ্ধ।

এভাবে তার জীবনচরিত অন্বেষণে কয়েকমাস কেটে গেল। হঠাৎ একদিন আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, এ বিষয়ে একটি বই লিখবো এবং খলিফা হারুনুর রশিদকে নিয়ে প্রশ্নোত্তর আকারে বইটি সাজাবো।

যেখানে আমি তাকে তার জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করবো আর তিনি উত্তর দেবেন। কিন্তু আমার আগেই আব্বাস মাহমুদ এ ধাঁচে ১৯৪৭ ঈসায়ী সনে একটি বই রচনা করেছিলেন। তাই আমি অন্যভাবে বইটি রচনার সিদ্ধান্ত নিলাম।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক সর্বশ্রেষ্ঠ আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদ সম্পর্কে তথ্য উপাত্তের খোঁজ আরও বাড়িয়ে দিলাম। অবশেষে চূড়ান্ত পরিমার্জন পরিশোধন শেষে এ মহান খলিফার জীবনচরিত সংক্রান্ত বইটি সমাপ্ত করতে সমর্থ হলাম। যে বইটিতে সাধারণ মানুষের চাহিদা ও চিন্তাশক্তির ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেছে বলে আমার বিশ্বাস।

খলিফা হারুনুর রশিদ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আব্বাসি শাসক। এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই। রাজ্য বিস্তার, সীমান্ত রক্ষা এবং শত্রুদের প্রতিরোধে তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তার আগে-পরের কোনো শাসক সে সাফল্যের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেনি।

পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ সব অঞ্চলের মানুষের কাছেই তিনি সুপরিচিত ও বিখ্যাত এক খলিফা হিসেবে প্রসিদ্ধ। তার সুবিশাল রাজ্য, তা পরিচালনায় তার নেওয়া অভিনব পদক্ষেপ এবং তার জ্ঞান-গরিমা ও প্রজ্ঞার স্তুতি সকলের মুখে মুখে শোভা পায়।

এছাড়া তিনি ছিলেন একজন খোদাভীরু প্রকৃত মুসলমান। যিনি ফরজ নামাজের পাশাপাশি বেশি বেশি নফল নামাজ পড়তেন, দানসদকা ও জাকাত যথাযথভাবে প্রদান করতেন, প্রায়ই হজ করতেন, এমনকি কয়েকবার তিনি হজ আদায়ের উদ্দেশ্যে পদব্রজে পবিত্র নগরী মক্কায় গমন করেন। মাঝেমধ্যে তিনি ঘনিষ্ঠজনদের সাথে বৈধ খোশগল্পও করতেন, তবে ঘুমিয়ে পড়লে ফজরের নামাজের জন্য সুবহে সাদিকের পূর্বেই তাদের জাগিয়ে দিতেন।

তিনি আলেম ওলামাদের সমাদর করতেন এবং তাদের বিভিন্ন সেমিনারে নিজ বিচক্ষণতা ও মেধাবলে যোগদান করতেন। সেখানে নিজে কবিতা রচনা করে আবৃত্তি করতেন। তার উস্তাদ ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ এবং তার সাম্রাজের বিচারক ছিলেন মুহাম্মদ বিন হাসান আশ শায়বানি রহিমাহুমুল্লাহ। সাম্রাজ্যের খুঁটিনাটি বিষয়েও তিনি এই দুজন থেকে এবং ইমাম মালেক বিন আনাস, আসমায়ি এবং কাসায়ি

রহিমাহুল্লাহুম-এর থেকে পরামর্শ নিতেন। জাবের বিন হাইয়ান, খুওয়ারজামি এবং কিনদী রহিমাহুল্লাহুম ও তার সময়ের। যারা বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞান ছড়িয়ে দিতে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। তিনি যখন তার সাম্রাজ্যের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতেন তখন আলেম-ওলামা ও কাজি-বিচারকদের এক গাম্ভীর্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ শোভাযাত্রা সাথে নিয়ে যেতেন।

আমর বিন বাহার বলেন, খলিফা হারুনুর রশিদের আমলে এমন বড় ও মহান ব্যক্তিত্বদের সমাগম ঘটেছিল যা অন্য কোনো খলিফার আমলে ঘটেনি। আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ ছিলেন তার সাম্রাজ্যের কাজি, ফযল বিন রবী ছিলেন তার পরামর্শক, যিনি তৎকালীন সময়ে সবচেয়ে বিচক্ষণ ও সম্মানিত মানুষ ছিলেন। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ওমর বিন মুহাম্মদ, সভাকবি ছিলেন মারওয়ান বিন আবি হাফসা, তাকে গীত শোনাতেন ইবরাহিম আল মুসিলী, যিনি সে যুগের একজন অনুপম গীতিকার ছিলেন। তাকে কৌতুক শুনিয়ে হাসাতেন বিন আবি মারইয়াম, বাঁশির সুর শুনিয়ে তাকে মুগ্ধ করতেন বুরসুমা। তার স্ত্রী ছিলেন উম্মে জাফর যুবায়দা, যিনি যেকোনো ভালোকাজের প্রতি সদা উৎসাহী এবং সবধরনের কল্যাণকর কাজে তৎপর এক রমণী ছিলেন। তিনি হাজিদের সুবিধার্থে হেরেম শরীফে একটি পানির নালা স্থাপন করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও আল্লাহ তাআলা তার বরকতময় হাতে বহু ভালো কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

বিন তাবাতবা বলেন, খলিফা হারুনুর রশিদের সাম্রাজ্য ছিল সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। সুনাম-সুখ্যাতি, উন্নতি-অগ্রগতি, রাজ্য বিস্তারে তার সাম্রাজ্য ছিল অনন্য ও অতুলনীয়। তার দরবারে সর্বদা আলেম-ওলামা, কবি-সাহিত্যিক, কাজি-বিচারক, ফুকাহায়ে কেরাম, লেখক ও ক্বারীদের এতবেশি সমাগম থাকতো যা অন্য কোনো শাসকের বেলায় কল্পনাও করা যায়নি। তিনি পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন এই মহান ব্যক্তিদের যেকোনো একজনকে উপঢৌকন পাঠিয়ে সম্মান জানাতেন। তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। হাদিস ও আসার বর্ণনা এবং কবিতা আবৃত্তিতেও তার দখল ছিল। তিনি একজন সুরুচিসম্পন্ন এবং সর্বসাধারণ্যে সমাদৃত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি আরও বলেন, বাদশাহদের মধ্যে খলিফা হারুনুর রশিদ ই ছিলেন সবচেয়ে জ্ঞানী, সুসাহিত্যিক এবং মর্যাদার অধিকারী।

খলিফা হারুনুর রশিদের কিছু প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই প্রখ্যাত ফকিহ ইমাম আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ বিখ্যাত 'খারাজ' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন, যে গ্রন্থটি ইসলামি সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতে এক ঐতিহাসিক প্রভাব বিস্তার করে। গ্রন্থটিতে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদার অনুসৃত পন্থায় মুসলমানদের রাজকোষাগারে রাজস্ব সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় অত্যন্ত সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যেন কোনো প্রজার ওপর অন্যায়-অবিচার না হয়।

খলিফা হারুনুর রশিদের রাজকোষাগার ছিল কানায় কানায় পূর্ণ ও সমৃদ্ধ। ধনসম্পদের প্রাচুর্য এতটাই প্রবল ছিল যে, তার সাম্রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলের যাবতীয় প্রয়োজনাদি পূরণ করার পরও কোষাগারে সম্পদ জমা থাকতো। তার সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বাগদাদ, যা সমগ্র ইসলামি শহরগুলোর আলেম-ওলামাদের কেন্দ্রস্থল ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির খোঁজে বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষজন সেখানে পাড়ি জমাতো।

আমি বইটি রচনায় দুটি ধাপ অবলম্বন করেছি —

প্রথম ধাপে খলিফা হারুনুর রশিদ সংক্রান্ত তথ্যাবলি একত্র করে সেগুলোকে যথাস্থানে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেন পাঠক কোনো ধরনের কষ্ট ও পেরেশানি ছাড়াই এ মহান খলিফা সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারে।

দ্বিতীয় ধাপে ওইসব হেতু ও কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোকে কেন্দ্র করে কতিপয় অসাধু লেখক এ মহান মুসলিম খলিফার জীবনচরিতকে সাধারণের মনন-মস্তিষ্কে বিকৃত ও কুৎসিত করে গেঁথে দিয়েছে।

এককথায় বইটি দুই অংশে বিভক্ত—

১. খলিফা হারুনুর রশিদ সংক্রান্ত তথ্যাবলি উল্লেখ।

২. এসব তথ্যাবলিকে বিকৃতিসাধনের কারণ অন্বেষণ।

আর সবশেষে পরিশিষ্ট হিসেবে এ মহান খলিফার জীবনচরিতে কালিমা লেপনের কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। আমি খলিফা হারুনুর রশিদ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করেছি। যদি সফল হই তবে এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। আর যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে তবুও আমার চেষ্টা-পরিশ্রমের বদৌলতে আল্লাহ আমাকে বিনিময় দিবেন

বলে আশা রাখি। আল্লাহ সাক্ষী আছেন, আমি এই বইটির মাধ্যমে একজন সম্মানিত ও মহান শাসককে তার ওপর উত্থাপিত মিথ্যা ও বানোয়াট সব অভিযোগ থেকে নিষ্কলুষ করতে চেয়েছি। কোনো দোষী ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ প্রমাণ করতে বা অহংকারী ও অত্যাচারী কোনো শাসককে বিনয়ী ও ভদ্র হিসেবে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচনা করিনি।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে প্রার্থনা, বইটি যেন শুভ ও কল্যাণকর হয়। তাঁর পবিত্র ও মহান নামের বরকতে শুরু করছি।

—— শাওকি আবু খলিল

দামেশক, সিরিয়া

বইটি যেভাবে সাজানো হয়েছে

১ম পরিচ্ছেদ

মুসলিম বিশ্বের খলিফা হারুনুর রশিদ—— ২১
মাতা খায়যুরান—— ৩১
সহধর্মিণী যুবায়দা বিনতে জাফর বিন মানসুর—— ৩৪
হারুনুর রশিদের পরিবার—— ৫২
খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ—— ৫৫
হারুনুর রশিদের ইন্তেকাল—— ৬২
হারুনুর রশিদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষা—— ৭২
হারুনুর রশিদের ঈমান—— ৯৫
হারুনুর রশিদের মজলিস——১১৯
হারুনুর রশিদের দান-দক্ষিণা—— ১৩৭
হারুনুর রশিদের যুগে সমাজব্যবস্থা—— ১৪৪
হারুনুর রশিদের যুগে প্রশাসক ও বিচারকবৃন্দ—— ১৫৫
হারুনুর রশিদের যুদ্ধ-জিহাদ—— ১৭৩
হারুনুর রশিদের সমসাময়িক মনীষীবৃন্দ—— ১৮০

- কাযি আবু ইউসুফ—— ১৮১
- মুহাম্মদ বিন হাসান আশ শায়বানি—— ২০১
- আবদুল্লাহ বিন মুবারক—— ২০৪
- ফুজাইল বিন আয়াজ—— ২০৭
- ইমাম মালেক বিন আনাস—— ২১৪
- ইমাম শাফেয়ি—— ২৫৭

২য় পরিচ্ছেদ

হারুনুর রশিদের জীবনচরিতে বিকৃতিসাধন——২৬৭

- আলিফ লায়লা——২৬৯
- আবুল ফারাজ ইসফাহানীর 'আল আগানি'—— ২৭১
- আহমদ আমিন রচিত গ্রন্থ 'হারুনুর রশিদ'—— ২৭৯
- কিতাব: ইলামুন নাস বিমা ওয়াকায়া লিল বারামিকাতি মাআ বানিল আব্বাস—— ২৮৮
- জুরজি জায়দান——২৯১
- তালেবিগণ—— ২৯২
- ইউরোপীয় গির্জাগুলোর বর্ণনা—— ২৯৭
- বারমাকিদের পতন ও দুর্যোগ—— ৩০০
- বারমাকিদের পতনে খলিফা কি অনুতপ্ত ছিলেন? —— ৩১৭

উপসংহার: হারুনুর রশিদের চরিত্রে বিকৃতিসাধনের কারণ—— ৩২৫

আব্বাসী খলিফাদের তালিকা ও তাদের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সময়কাল—৩৩১

মুসলিম বিশ্বের খলিফা হারুনুর রশিদ

"খলিফা হারুনুর রশিদের যুগ পুরোটাই ছিল
মঙ্গল ও কল্যাণে ভরপুর,
সৌন্দর্যে যেন তা নববধূর উপমা"

জন্ম ও বংশ

হারুনুর রশিদ বিন মুহাম্মদ আল মাহদি বিন আবদুল্লাহ আল মানসুর বিন মুহাম্মদ বিন আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব। ১৭০ হিজরিতে তার ভ্রাতা মুসা আল হাদির ইন্তেকালের পর তিনি খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তার মায়ের নাম খায়যুরান আল জুরাশিয়্যাহ। ১৫০ হিজরির জিলহজ মাসে 'রায়' শহরে তার জন্ম হয়।[১] তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, সুঠামদেহী, উজ্জ্বল বর্ণের অধিকারী এবং সুস্পষ্টভাষী একজন মানুষ। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আদব-শিষ্টাচারের ব্যাপারে যত্নশীল। তিনি ইলম ও আলেম-উলামাদের ভালোবাসতেন। ইসলামের সম্মান রক্ষায় তিনি ছিলেন একজন আপোসহীন ব্যক্তিত্ব। দীনী বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক এবং শরিয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিপরীতে মত পেশ করাকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি

[১] হারুনুর রশিদের জন্মসাল নিয়ে ইতিহাসবিদের তিনটি মত আছে। ১৪৫,১৪৬ ও১৪৯ হিজরি। (আব্বাসিয়্যুনাল আকবিয়া : ৩৯৫)

সবসময় বিশেষ করে উপদেশ শ্রবণকালে খুব বেশি কান্নাকাটি করতেন।[২] তিনি একবছর হজ করলে পরবর্তী বছর আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে কাটাতেন। বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে তিনি দৈনিক একশ রাকাত নামাজ পড়তেন, যা তার সারাজীবনের আমল ছিল।[৩] যে বছর তিনি হজে যেতেন সাথে করে ফুকাহায়ে কেরাম ও তাদের সন্তানদের একশ জনের জামাত সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আর যে বছর জিহাদ বা যুদ্ধের কারণে হজে যেতে না পারতেন সে বছর নিজ খরচে পর্যাপ্ত ভরণপোষণ ও পাথেয় সামগ্রী দিয়ে তিনশ জনকে হজে পাঠাতেন।

রাজ্যাভিষেক

হারুনুর রশিদের ভ্রাতা মুসা আল হাদি পরবর্তী খলিফা হিসেবে তাকে বঞ্চিত করে নিজ পুত্র জাফরকে নিযুক্ত করে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিজ বীরত্ব-সাহসিকতা ও উন্নত চরিত্র মাধুর্যতাবলে হারুনুর রশিদই খলিফা হিসেবে উপযুক্ত বিবেচিত হন। অবশেষে ১৭০ হিজরির ১৪ রবিউল আউয়াল শুক্রবার দিন শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বাগদাদে ১৯ বছর ২ মাস ১৩ দিন বয়সে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর সে রাতেই তার ঔরসে তার পুত্র মামুন জন্মলাভ করে।

মোটকথা, একই রাতে পূর্ববর্তী খলিফা মুসা আল হাদি মারা যান, হারুনুর রশিদ খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হন এবং পরবর্তী খলিফা মামুন জন্মগ্রহণ করে।[৪] তিনি তার পূর্বসূরি খলিফা মানসুরকে[৫] পথিকৃৎ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তবে দান-দক্ষিণা ও উপহার উপঢৌকন প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি মানসুরের চেয়েও একধাপ অগ্রসর ছিলেন। দানসদকার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত উদারহস্ত ছিলেন। আজ যেটা দান করার তা আগামীকালের জন্য বিলম্ব করতেন না। ফিকহ এবং ফকিহদের প্রতি ছিল তার অগাধ ভালোবাসা, ইলম ও আলেম-উলামাদের প্রতি ছিল তার সীমাহীন ভক্তি। তিনি কবিতা পছন্দ করতেন ও তা সংরক্ষণ করতেন। কবিদের পছন্দ

---

[২] তারিখে বাগদাদ : ১৪/৫

[৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/২১৪

[৪] তারিখে বাগদাদ : ১৪/৫

[৫] খলিফা মানসুরের পরিচয় : তিনি হলেন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আলি বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব। ১৩৬ হিজরীতে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার রাজত্বকাল ছিল ২২ বছর। তিনি হারুনুর রশিদের দাদা।

করতেন এবং বিভিন্ন সময় তাদের থেকে কবিতা শুনে প্রীত হতেন। এছাড়া তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যপ্রেমী মানুষ। দ্বীনি বিষয়ে বাক-বিতণ্ডা ও তর্ক-বিতর্ককে তিনি অপছন্দ করতেন এবং বলতেন, এসব বিতর্ক শুধু অকল্যাণই বয়ে আনে।[৬] তিনি স্তুতি ও প্রশংসাবাণী শুনতে ভালোবাসতেন, বিশেষত যখন তা কোনো সম্ভ্রান্ত ও সুস্পষ্টভাষী কবির রচিত হতো। এজন্য তিনি তাদের পুরস্কৃতও করতেন।

পণ্ডিত ও ইতিহাসবেত্তাদের মতে, খলিফা হারুনুর রশিদের সময়ে এত বড় বড় ও মহান ব্যক্তিত্বদের আগমন ঘটেছিল যা অন্য কোনো খলিফার বেলায় ঘটেনি। তার সভাসদবৃন্দ ছিলেন বার্মাকি গোত্রের। প্রাচুর্য ও বদান্যতায় যাদের কোনো নজীর ছিল না। সাম্রাজ্যের কাজি ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ। সভাকবি ছিলেন মারওয়ান বিন আবু হাফসা, যিনি নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। সহকারী ছিলেন তারই পিতার চাচা আব্বাস বিন মুহাম্মদ। পরামর্শক ছিলেন ফজল বিন রবি, যিনি মানুষের মাঝে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাকে গীত শোনাতেন ইবরাহিম আল মুসিলী, যিনি তৎকালীন যুগের একজন অনুপম গীতিকার ছিলেন। বাঁশির সুর শুনিয়ে তাকে মুগ্ধ করতেন বুরসুমা। তার জীবনসঙ্গিনী ছিলেন উম্মে জাফর যুবায়দা, যিনি সর্বপ্রকার কল্যাণকর কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। যিনি নিজ উদ্যোগে হাজিদের সুবিধার্থে হেরেম শরীফে একটি পানির নালা স্থাপন করে দিয়েছিলেন।[৭]

ইমাম কাসায়ি রহিমাহুল্লাহ ছিলেন তার এবং তার দুই ছেলে আলআমিন এবং মামুনের উস্তাদ, যিনি নাহু, সরফ, আরবি সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। হামজা যাইয়াতের কাছে তিনি কুরআন শিখেন। বয়স বেড়ে যাওয়ার পর তিনি নাহুশাস্ত্র শেখায় মনোনিবেশ করেন এবং বসরায় গিয়ে প্রখ্যাত নাহুবিদ খলিল বিন আহমদের[৮] সঙ্গী হন।

মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া আল বার্মাকির সূত্রে আবু হাফস কিরমানি বর্ণনা করেন, মুসা আল হাদি খলিফা থাকাকালে একরাতে ইয়াহইয়াকে ডেকে পাঠালেন। ইয়াহইয়া নিজের জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন আজ তাকে হত্যা করা হবে। তাই তিনি পরিবারকে বিদায় জানালেন, সুগন্ধি মাখলেন এবং নতুন

---

[৬] তারিখে বাগদাদ : ১৪/৭

[৭] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১৪/৩৫

[৮] খলিল বিন আহমদের পরিচয়: তিনি হলেন ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম খলিল বিন আহমদ আল ফারাহিদি। তিনিই ছন্দশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ১০০ হিজরীতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭০ হিজরীতে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। আল আলাম : ২/৩৬৩

কাপড় পরে মুসা আল হাদির দরবারে এলেন। আসা মাত্রই হাদি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়াহইয়া! আমার সাথে তোমার কীসের বিরোধ?

ইয়াহইয়া: হে আমিরুল মুমিনিন! আমি তো আপনার একজন দাস মাত্র। একজন দাসের জন্য তার মনিবের অনুগত হওয়া ছাড়া কী-ই বা করার আছে ?

হাদি: তবে কেন তুমি আমার ভাই হারুনুর রশিদকে আমার বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছো?

ইয়াহইয়া: আমি আপনাদের মাঝে প্রবেশ করার কে? আমাকে তো আপনাদের পিতা মাহদি সর্বদা তার সাথে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমি শুধু তার আদেশ পালন করি। এরপর আপনিও তো আমাকে এ আদেশ দিয়েছেন। আর আপনার আদেশ আমার জন্য শিরোধার্য।

হাদি: তাহলে আমার ভাই হারুনের বিদ্রোহের ব্যাপারে কী বলবে ?

ইয়াহইয়া: তিনি কোনো বিদ্রোহ করেননি এবং এ ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহও নেই।

তার কথায় হাদির রাগ কিছুটা প্রশমিত হয়।[৯] বাস্তবিকপক্ষেই হারুনুর রশিদ ক্ষমতার প্রতি নির্মোহ ছিলেন। তিনি ক্ষমতাহীন সাধারণ জীবনযাপনকেই নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করতেন। ইয়াহইয়া একবার এব্যাপারে তাকে সতর্ক করলে তিনি উত্তরে বললেন, আমার চাচাতো বোনের (স্ত্রী যুবায়দা) সাথে সুখময় ও স্বাচ্ছন্দ জীবনই আমার জন্য যথেষ্ট।

হারুনুর রশিদ তার স্ত্রী উম্মে জাফরকে খুব বেশি ভালোবাসতেন। তাই একদিন ইয়াহইয়া তাকে বললেন, আপনার এ ভালোবাসার আধিক্য কি একজন খলিফার সাজে !? দেখবেন এটা যেন আপনার ব্যর্থতার কারণ না হয়। হারুনুর রশিদ তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নিশ্চুপ রইলেন।

আল্লামা কিরমানি রহিমাহুল্লাহ খুযায়মা বিন আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেন, হারুনুর রশিদকে খেলাফতের মসনদ থেকে বঞ্চিত করে নিজ পুত্র জাফরকে পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত করার পর যেন কোনো বিদ্রোহ দানা বাঁধতে না পারে এজন্য মুসা আল হাদি ইয়াহইয়া বিন খালেদকে বন্দি করার আদেশ দিলেন। তখন ইয়াহইয়া এক টুকরো কাগজ উঁচিয়ে ধরে বললেন, আমিরুল মুমিনিন! আপনার জন্য আমার একটি পরামর্শ আছে। তার কথা শুনে হাদি তাকে কাছে ডেকে সে পরামর্শ শুনতে

---

[৯] অনুরূপ একটি ঘটনা তারিখুত তারিখুত তাবারি তে এসেছে। তারিখুত তারিখুত তাবারি : ৪/৬০৮

চাইলেন। ইয়াহইয়া বললেন, আমাকে আগে মুক্ত করুন। তাকে মুক্ত করা হলে তিনি বললেন, আমিরুল মুমিনিন! আপনি যা চাচ্ছেন তা-ই যদি হয়, (এমনটি হওয়া থেকে আল্লাহর পানাহ চাই) আপনার কী মনে হয়, জনগণ আপনার পুত্র জাফরের খেলাফত মেনে নিবে যে কি না এখনও প্রাপ্তবয়স্কই হয়নি? তাছাড়া তারা কি নিজেদের নামাজ, হজ এবং যুদ্ধ-জিহাদের ক্ষেত্রে তাকে আমির হিসেবে গ্রহণ করবে?

হাদি: আল্লাহর শপথ! আমি এমনটি মনে করি না।

ইয়াহইয়া: তাহলে অন্যান্যদের চেয়ে আপনার পরিবার ও বংশের আর কী শ্রেষ্ঠত্ব রইলো? এমন হলে তো অন্যান্যরাও খেলাফতের ব্যাপারে লোভ করবে। একপর্যায়ে খেলাফত আপনাদের বংশের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

ইয়াহইয়ার এই সারগর্ভপূর্ণ কথায় হাদি সম্বিত ফিরে পেয়ে বললেন, ইয়াহইয়া! আপনি আমার চোখ খুলে দিলেন। এজন্যই ইয়াহইয়া বলতেন, যতজন খলিফার সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে মুসা ছিলেন সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। অতঃপর ইয়াহইয়া তাকে বললেন, আপনার ভাই হারুনুর রশিদ খলিফা হওয়ার উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি আপনি তাকে খেলাফত থেকে বঞ্চিত করেন, তবে সেটা হবে আপনার পিতা মাহদির অবাধ্যতা।[১০] এজন্য আমার পরামর্শ হলো, খেলাফতকে তার আপন গতিতে চলতে দিন। এরপর যখন আপনার পুত্র জাফর প্রাপ্তবয়স্ক হবে আমি তাকে হারুনুর রশিদের কাছে নিয়ে যাবো। আর তিনি খেলাফতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে জাফরকে খলিফার আসনে বসাবেন। খলিফা মুসা আল হাদি তার প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং তাকে ছেড়ে দিলেন।

মুহাম্মদ বিন উমর রুমি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, খলিফা মুসা আল হাদি খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এক বিশেষ সভার আয়োজন করলেন। সভায় তিনি ইবরাহিম বিন জাফর বিন আবু জাফর, ইবরাহিম বিন সালাম বিন কুতায়বা এবং হাররানিকেও আমন্ত্রণ জানালেন। তারা এলে তিনি তাদের নিজের বামদিকে বসালেন। সভায় তাদের সাথে আসলাম নাম্মী মুসার এক কৃষ্ণকায় সেবক উপস্থিত ছিল, যার উপনাম আবু সুলায়মান। সে মুসার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন সেবক ছিল। সভা চলছিলো। ইত্যবসরে হারুনুর রশিদ সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। মুসা অনুমতি দিলেন। হারুনুর রশিদ সভায় উপস্থিত

---

[১০] কারণ তিনি হারুনুর রশিদকে আপনার পর খেলাফতের জন্য উপযুক্ত ঘোষণা করেছিলেন।

হয়ে মুসাকে সালাম করলেন, তার হাতে চুমু খেলেন।

এরপর তার ডানদিকের শেষপ্রান্তে বসে পড়লেন। মুসা কিছুক্ষণ তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন। এরপর সম্বোধন করে বললেন, আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তুমি স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে প্ররোচিত করছো। তুমি এমন এক জিনিসের আশা করছো যা তোমার থেকে অনেক দূরে। তোমার পক্ষে তা অর্জন করা কখনই সম্ভব নয়। তুমি খলিফা হওয়ার স্বপ্ন দেখছো !?

মুসার কথা শুনে হারুনুর রশিদ হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং বললেন, মনে রাখবেন, যদি আপনি স্বেচ্ছাচারী হন তবে লাঞ্ছিত হবেন, যদি বিনয়ী হন তবে আপনার মর্যাদা বেড়ে যাবে, আর যদি অন্যায়-অবিচার করেন তবে ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হবেন। নিশ্চয় আমি খেলাফতের দায়িত্ব কামনা করি, যেন আপনি যাদের ওপর অন্যায়-অবিচার করেছেন তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারি, যে সম্পর্ক আপনি ছিন্ন করেছেন তা জোড়া লাগাতে পারি, আপনার সন্তান ও তাদের স্ত্রীদের আমার নিজের ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশি পরিণত করে গড়ে তুলতে পারি এবং একজন সুপথপ্রাপ্ত ইমামের যে সকল দায়িত্ব রয়েছে সেগুলো সুচারুরূপে সমাধা করতে পারি।

মুসা বললেন, হে আবু জাফর! তোমার মনোবাসনা যথার্থ। তুমি আমার কাছে এসো। কাছে আসলে তিনি হারুনুর রশিদের হস্তদ্বয়ে চুমু খেলেন এবং রাজদরবারে ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। হারুনুর রশিদ বললেন, আপনার মহৎ ও সম্ভ্রান্ত পিতা মানসুরের শপথ করে বলছি, আমাকে ছাড়া রাজদরবারে যাবেন না। ফলে মুসা তাকে রাজদরবারে নিয়ে গেলেন এবং হাররানিকে বললেন, তুমি আমার ভাইয়ের জন্য কয়েক হাজার দিনার প্রস্তুত করো। যখন রাজস্ব আদায়ের সময় হবে তখন সেখান থেকে অর্ধেক তার জন্য বরাদ্দ করবে এবং আমাদের ধনভান্ডার তার জন্য উন্মুক্ত করে দাও। সে যেন যা ইচ্ছা সেখান থেকে নিতে পারে। হাররানি তা-ই করলেন।

এ ঘটনার পর মুহাম্মদ বিন উমর রুমি বলেন, হারুনুর রশিদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই আমি তাকে বললাম, জনাব! আমিরুল মুমিনিন আপনাকে কোন স্বপ্নের কথা বললেন? তিনি বললেন, আমার পিতা মাহদি বলেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি মুসা এবং হারুনকে একটি করে ডাল দিলাম। কিছুদিন পর মুসার ডালটির ওপরের দিকে অল্পকিছু পাতা গজালো। অপরদিকে হারুনের ডালটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাতায় ভরে গেল।